Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 403 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 403 - 411
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

আধুনিক সাহিত্য ও শিক্ষায় মহারাণী সুনীতি দেবীর অবদান

মানিক পাল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
শীতলকুচি কলেজ, কোচবিহার
Email ID : manikpaul10@gmal.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Autobiography, literature, royal, reform consort, pioneer, modernity, freedom, colonial India, education.

Abstract

Among all the noble women who have left their marks in golden letters in the transformation of society and education in India, the name of Maharani Suniti Devi, the daughter of Brahmananda Keshav Chandra Sen and the consort of the then Maharaja Nripendra Narayan of Cooch Behar, is the most memorable. Suniti Devi's contribution to the world of Bengali and English literature at the turn of the 19th and 20th centuries is undeniable. Among the Bengali poetry books written by Suniti Devi were “Shibnath” ‘Amritabindu part - I, II’, Sangha Shankh”, ‘Sahana’, ‘Kathakatha’, “Shishu Keshav” etc. She authored english books like "The Beautiful Mogul Princesses’, "Bengal Dacoits and Tigers""The Life of Princess Yashodara’ etc. His autobiography is ‘The Autobiography of an Indian Princess’. *Her autobiography not only reflects her personal journey but also her commitment to advocating for social change and the rights of women in colonial India. With the encouragement of Suniti Devi, Maharaja's wife paid attention to the spread of education. The new horizon of modern education and culture in the heart of the royal family was started by Suniti Devi's sole efforts. After the marriage of Maharani Suniti Devi, the tide of reform free modern thought came in the state of Cooch Behar. As Maharaja Nripendra Narayan is called the shaper of the modern state of Cooch Behar in terms of state governance and all kinds of developmental work, there is no denying that Maharani Suniti Devi was the main supporter of the work. Suniti Devi did not stop at only establishing Suniti College in Cooch Behar. Outside the state, the wife has contributed to education and social progress of the women's society. Suniti Dev had constant contact with the Victoria Institution in Calcutta and the Maharani Girls' School in Darjeeling. Cooch Behar played an important role in the transition to modernity, although this native state at that time called him the pioneer of women's freedom. Cooch Behar played an important role in the transition to modernity, although this native state at that time called him the pioneer of women's freedom.*

Discussion

ঊনবিংশ শতাব্দী হচ্ছে ভারতের ইতিহাসে এক পালাবদলের সময়কাল। এই সময়কালেই বেশ কিছু সমাজ সংস্কারক, সমাজ দরদি এবং শিক্ষা সংস্কারক ব্যক্তিবর্গের উদ্ভব হয়েছিল, যাদের নিরলস কর্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধির অবসানের মধ্যদিয়ে আধুনিক যুগের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই সময় ভারতের বুকে যে সকল মহিয়সী নারী সমাজ ও শিক্ষার পটপরিবর্তনে নিজের দাগ স্বর্ণাক্ষরে রেখে গেছেন তাদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের কন্যা তথা কোচবিহারের তদানীন্তন মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সহধর্মিনী মহারানী সুনীতি দেবীর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

কলকাতার পারিবারিক ঐতিহ্যের অধিকারী সেন পরিবারে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর সুনীতি দেবী জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।[১] তাঁর পিতা ছিলেন প্যারীমোহন সেন ও সারদা সুন্দরী দেবীর দ্বিতীয় সন্তান ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন এবং মাতা ছিলেন বালিগঞ্জ নিবাসী চন্দ্র মজুমদারের কন্যা গোলাপ সুন্দরী তথা জগম্মোহন দেবী। পিতা কেশব চন্দ্র সেন ছিলেন আদর্শবান, ধর্মপরায়ণ দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। মাতা ছিলেন ধর্মপরায়ণা, আদর্শবতী, পতিপরায়ণা, আত্মবিশ্বাসী, সহজ সরল এবং শান্ত স্বভাবের মহিলা, এরূপ একটি শান্ত নির্মল ঘরোয়া সুন্দর পরিমণ্ডলে কোচবিহারের ভাবী মহারানী সুনীতি দেবী বড় হয়েছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন নব জাগরণের মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। কেশব চন্দ্র সেন বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রিধারী শিক্ষার পরিবর্তে বাঙালি নারীদের নৈতিক ও মানসিক বিকাশের সর্বাঙ্গীন শিক্ষার প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন। তাঁর সন্তানদের ক্ষেত্রেও এই আগ্রহের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে, এ সম্পর্কে মহারানী সুনীতি দেবী বলেছেন-

> "my father used to tell us stories from the Bible and other sacred books and I remember how much impressed we were with the story of the Ten virgins."[২]

কোচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী সম্পর্কে বলা Environment এবং Heredity উভয় দিক থেকেই সাহিত্য রচনার উপযুক্ত পরিবেশ তিনি পেয়েছিলেন। সুনীতি দেবী কোচবিহারের রাজ পরিবারের প্রথম মহিলা সাহিত্যিক নন তবে একথা সত্য যে, তিনিই সর্বাপেক্ষা কৃতী সাহিত্যিক ছিলেন। তার সময় শুধু রাজপরিবারেই নয় রাজপ্রাসাদেও তার দলের গণ্ডি ছাড়িয়ে সমগ্র কোচবিহার রাজ্যের সাহিত্যিক জগতে এক নতুন সৃষ্টির জোয়ার এসেছিল। এক নতুন যুগের অভ্যুত্থান ঘটে। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই সুনীতি দেবীর দক্ষতা ছিল চোখে পড়ার মত। তারই সাক্ষী বহন করে তার রচিত গ্রন্থগুলি। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের জগতে সুনীতি দেবীর অবদান অনস্বীকার্য।

কোচবিহারের রাজ দরবারে যে সকল মহিলা লেখিকারা সাহিত্য রচনা করে গেছেন তাদের মধ্যে উজ্জ্বল লেখিকা ছিলেন কোচবিহারের রাজমাতা সুনীতি দেবী। শিশু বয়স থেকেই পিতা-মাতার আদর্শে অবিচল সুনীতি দেবী স্বাধীন, চিন্তনশীলমন, কর্তব্যনিষ্ঠা ছিলেন। রাজ পরিবারের সাহিত্য চর্চা আলোচনা করতে গেলে মহারানী সুনীতি দেবীর নাম সর্বাগ্রে উঠে আসে। শিশুকাল থেকেই যেমন কবিতা লিখতেন, তেমনি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে গল্পের আকার কথকতা করতে পারতেন। নববিধান ব্রহ্ম সমাজের মুখপত্র 'সুকথা' পত্রিকা কোচবিহার রাজানুকূলে। এই সুকথা পত্রিকাকে ঘিরেই তার বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হতে থাকে।[৩] সুকথা পত্রিকায় বামাবন্দনা নামের আড়ালে যে সুনীতি দেবী সে কথা তার কবিতা প্রমাণ করে। এই নামে অনেক কবিতায় সুকথা পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়, যাতে স্থান পেয়েছে শৈশব, আনন্দ-উচ্ছাস, বসন্ত সমাগম, মৃত্যু প্রভৃতি।

ছেলেবেলা থেকেই সুনীতি দেবী গল্প শুনতে ভালবাসতেন ঘুমোতে যাওয়ার সময় মায়ের কাছে Fairy Tales এর গল্প শুনতেন পরবর্তী জীবনে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেও অনেক গল্প শুনেছেন।[৪] এর ফলস্বরূপ জীবনের শেষ লগ্নে তিনি রচনা করেছেন Fairy Tales বইখানা।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে সুনীতি দেবীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থের নাম 'গাঁথা'। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে সুনীতি দেবীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা ও গান' প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ১৬৪টি কবিতা ও সংগীত নিয়ে প্রকাশিত হয় তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ অমৃত বিন্দু প্রথম খন্ড। এই গ্রন্থের প্রথমেই নিজেকে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের একজন সেবিকা বলে উল্লেখ করেছেন।

সংগীত জগতে তাল, লয়ের ক্ষেত্রেও মহারানী সুনীতি দেবী অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারীনী ছিলেন। সেই জন্যেই তার রচিত গ্রন্থে ঝাঁপতাল, খয়রাতাল প্রকৃতি তালের ধ্বনি তার লেখায় অনুরঞ্জিত হতে দেখা গেছে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তার কাব্যগ্রন্থ 'অমৃতবিন্দু' দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থটিতে মহারানী সুনীতি দেবী ৩৩ টি গান ও কবিতা লিপিবদ্ধ করেছেন। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ২২। উক্ত গ্রন্থটিকে মহারানী সুনীতি দেবী নববিধানাচার্য পিতা কেশবচন্দ্র সেনের জন্মউপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। দেবীর অমৃত বিন্দু কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ বিষয় ধর্ম হলেও এ কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি প্রেম, বিরহ, কাতর প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে -

> "ঘরের লক্ষ্মী ভাগ্যবতী
> বংশ ধর মায়ের কোলে আনন্দে দোলে।
> আহা মরি কিবা শোভা,
> নরনারী মনোলোভা,
> এমন চিত্র কে আঁকিল ধরা তলে।।"[৫]

মহারানী সুনীতি দেবীর রচিত তৃতীয় গ্রন্থটির নাম 'শিবনাথ' সাধারণত ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত ১৩২৮ বঙ্গাব্দে। এই গল্পটি শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত বলা যেতে পারে তবে শুধু জীবনচরিত বললে কম হয়। সুন্দর সাবলীল ভাষায় উক্ত গ্রন্থে তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।[৬]

মহারানী সুনীতি দেবীর আরেকটি গ্রন্থ হল 'সজ্ঘ শঙ্খ' গ্রন্থটি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে (১৩২১ বঙ্গাব্দে) রচিত হয়। এই গ্রন্থটি মহারানী সুনীতি দেবীর সংগীত সংগ্রহ। এই সংগীত সংগ্রহে মহারানীর মোট ৭৫ পৃষ্ঠায় ৮৩টি গান স্থান পেয়েছে অনেকগুলি গানে আবার সুর, তাল প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই সংকলনটি বৈচিত্রের স্বাদে ভরপুর। উক্ত গ্রন্থটিতে সংগীতগুলির রচনাকাল লেখা নেই, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুরের উল্লেখ আছে, যেমন- ঝিঝিট, মিশ্র , কাহারবা, কনেড়া , একতালা, সুরট, মল্লার, ভৈরবীযৎ, খেমটা ,ভাটিয়ালি প্রভৃতি। সংগীত জগতের সঙ্গে যে অগাধ পাণ্ডিত্য ও দখল ছিল তার রচনাগুলির সাহায্যে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বিরাট সংকলনের একঘেয়েমির কোন অবকাশ নেই। একটি রাজ্যের মহারানী হয়েও সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও ভক্তি সাগরে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায় সজ্ঘ শঙ্খের উল্লেখিত গান গুলির মধ্যে।

সুনীতি দেবীর গল্পগ্রন্থ 'সাহানা' প্রকাশিত হয় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। এই গ্রন্থটি গদ্য ও পদ্যের সম্ভারে সমৃদ্ধশালী। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৭৭। সাহানা গ্রন্থটির পদ্যাংশের ক্ষেত্রে দেখতে পাই মহারানী কেবলমাত্র ভক্তিরসের পূজারী ছিলেন না তিনি একজন প্রকৃতির পূজারীও ছিলেন।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'কথকতার গান' এই গ্রন্থটি বাংলার পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে সংকলিত সংগীত।[৭] এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯ এর একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক গান রচনা করেছেন। যেমন - রাজা হরিশচন্দ্র, ধ্রুবের গান, সুনীতির গান, ঐন্দ্রিলা, শচীর গান, ভীষ্ম বিজয়, বুদ্ধদেব চরিত, সতী, জনার গান ও সীতার গান। এইভাবে মোট আটটি বিষয়ের উপর ৪৯টি সংগীতের অবতারণা করে তিনি উক্ত সংগীত সংগ্রহখানি রচনা করেছেন। এতে ভক্তির সঙ্গে ভাষা, ছন্দ, তাল, লয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে 'ঝড়ের দোলা' প্রকাশিত উল্লেখিত গ্রন্থখানি মহারানীর একক রচনা সমগ্র নয় তিনি ছাড়া আরো সমসাময়িক যুগের তিনজন লেখকের রচিত ছোটগল্প সংকলিত হয়েছে উক্ত গ্রন্থখানিতে। চারটি গল্পগ্রন্থের মধ্যে মহারানী দেবীর একটি গল্পগ্রন্থ আছে। এতে মোট ৯৫ টি পৃষ্ঠা আছে। ঝড়ের দোলা গ্রন্থখানির গল্প গুলি হল– ১. পাগল- শ্রী সুনীতি দেবী ২. মাধুরী- শ্রী গোকুল চন্দ্র নাগ ৩. শ্রীপতি- শ্রী মনীন্দ্রলাল বসু ৪. জয়মালা- শ্রী দিনেশ রঞ্জন দাস। এই সংকলন প্রমাণ করে যে দেবী শুধু একজন সুসাহিত্যিক বা লেখিকা ছিলেন না পাশাপাশি একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে যে সমসাময়িক যুগে একটি সুন্দর সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল যার মধ্যমণি ছিলেন তিনি নিজে।

মহারানী সুনীতি দেবীর রচিত অপর গ্রন্থটি হল 'শিশু কেশব'। মোট ১৫ পৃষ্ঠার মধ্যে কেশব চন্দ্র সেন এর বাল্য জীবনের ইতিহাস সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন লেখিকা।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে একটি ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ “The Beautiful Mongul Princes" প্রকাশিত হয় এই গ্রন্থে রাজপুত্র বেগম অফ আকবর, মমতাজ মহল, প্রিন্সেস নুরজাহান প্রভৃতি গল্পগুলি স্থান পেয়েছে ।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের সংক্ষিপ্ত জীবন সাহিত্য নিয়ে প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ ‘পূর্ণ স্মৃতি’। উক্ত গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের সংক্ষিপ্ত সাহিত্যজীবনী এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু। এছাড়াও সুনীতি দেবীর ইংরেজিতে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয় সেগুলি হল- ‘Nine ideal Indian Women’ (1919) উক্ত গ্রন্থের প্রথম গল্পটির নাম সতী। এই সতী গল্পটির অবলম্বনে পরবর্তী সময়ে বাংলা সতী নামে একটি গীতিনাট্য রচনা করেছেন সুনীতি দেবী।

মহারানী সুনীতি দেবীর রচিত প্রথম ইংরেজি গ্রন্থটির নাম হল ‘The Rajput Princesses’। ভারতের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে চারটি গল্পের অবতারণা করে, মোট 88 পৃষ্ঠার মধ্যে লেখিকা গ্রন্থখানিকে সমাপ্ত করেছেন। উক্ত গ্রন্থটিতে গল্প গুলি হল– ১. BAPPA : WARRIOR AND KING, ২. PUDMINI THE BEAUTIFUL, ৩. THE GOLDEN AGE OF HINDUSTAN, 8. KRISHNA KOMARI.

সুনীতি দেবী সাধারণ মানুষের বোঝার সুবিধার জন্য এবং আকর্ষণীয় করাবার জন্য প্রত্যেকটি গল্পে এক বা একাধিক তৈলচিত্র সন্নিবেশিত করেছেন। গ্রন্থখানিতে মোট তৈল চিত্রের সংখ্যা ৮। ইতিহাসও যে যোগ্য লোকের লেখনীতে সাহিত্য হয়ে যায় তার প্রমাণ হল গ্রন্থটি। মহারানী সুনীতি দেবীর অপর একটি ইংরেজি গ্রন্থ হল ‘Bengal Dacoits ang Tiger’ গ্রন্থটি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। উক্ত গ্রন্থখানিতে মহারানী নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কতগুলি গল্প লিখেছেন। Dacoits Stories তে ১১টি এবং Tiger Stories-এ ৯টি গল্প আছে।

সুনীতি দেবীর নিজের জীবন কথা তার বিশ্বস্ত দলিল হল ‘The Autobiography of an Indian Princess: Memories of Maharani Sunity Devi of Cooch Behar’ (১৯২১ খ্রিস্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। ১৫টি পর্বের মাধ্যমে তিনি এই গ্রন্থের ইতি টেনেছেন। উক্ত গ্রন্থ খানির পৃষ্টা সংখ্যা মোট ২৫১ যার মধ্যে ২৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং ২৪৩ পৃষ্ঠা থেকে ২৫১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত Index. এই গ্রন্থখানিতে নিজের অভিজ্ঞতাকে যথার্থভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রে সুনীতি দেবী সফলতা লাভ করেছেন।

‘The Beautiful Mongul Princesses’ রচিত হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে। উক্ত গ্রন্থখানিও মহারানী সুনীতি দেবীর এক অনবদ্য সৃষ্টি। এই গ্রন্থখানির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৯। পাঁচটি ঐতিহাসিক কাহিনী রচিত হয়েছে উক্ত গ্রন্থটিতে - The enchanted violin, Mumtaza Mahal, Princess Reba, Zebunnissa, Nurjahan the light of the World সুন্দর রচনাশৈলী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীর মনোরম উপস্থাপনা মহারানী সুনীতি দেবীর গ্রন্থখানিকে সাধারণ মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করেছে। মহারানী সুনীতি দেবীর ‘The life of Princesses Yashodora’ একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এই গ্রন্থটি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে রচিত। ব্রাহ্ম ধর্মের বিশ্বাসী হয়েও অন্য ধর্মের প্রতিও যে তার গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল তারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় উক্ত গ্রন্থটিতে। এই গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন তার পুত্র নিতেন্দ্র নারায়ণকে। গ্রন্থখানিতে মোট পৃষ্ঠার সংখ্যা ৭২ এবং Index সহ-৭৫ এবং ১১টি তৈলচিত্র এবং কপিলাবস্তুর ম্যাপ রয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকা অংশে মহারানী সুনিতি দেবী যশোদারার পরিবেশ ও পরিস্থিতি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে যুক্তির সঙ্গে বাস্তব জীবনের প্রেম বিরহ ও ত্যাগের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। গ্রন্থটিতে তৎকালীন ভারতের সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মীয় বিবর্তনের সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। গ্রন্থটি মোট ৬টি গল্পের সমষ্টি এবং এর মোট সংখ্যা ৮৪। গল্প গুলি হল- The Needle Prince, The snake Prince, The Monkey, Sabar Karo, Dup Raj, The Dead Prince.

মহারানী সুনীতি দেবী ৯ জন ভারতীয় মহিলার চরিত্র এঁকেছেন ‘Nine Ideal IndianWomen’ গ্রন্থটিতে। করুন রস ও বীর রসের প্রাচীন নারী চরিত্রগুলি তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থটিতে। শুধু ভারতবর্ষেই নয় সম্পূর্ণ পৃথিবীর সঙ্গে কোচবিহারের মহারানীর একটি আত্তিক সম্পর্ক ছিল তা গ্রন্থটির উৎসর্গ অংশ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। গ্রন্থখানিতে ২১৪টি পৃষ্ঠা আছে এই গ্রন্থের গল্প সমূহগুলি হল- Sati, Suniti, Sukantala, Savitri, Shaibya, Sita, Pramila, Damayanti, Uttara. মহারানী সুনীতি দেবী ভক্তিরসযুক্ত ভিন্নস্বাদের একখানি ইংরেজি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তার

নাম ‘Prayers’। গ্রন্থখানি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। সুনীতি দেবীর এই গ্রন্থখানি শুধু রাজপরিবারের মধ্যেই সমাদৃত হয়নি তার এই সাহিত্য সাধনা সমাদৃত হয়েছিল ভারতবর্ষে ও বিদেশেও।

কোচবিহার রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা পর্ব থেকেই একশ্রেণী সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রচার করতে থাকে, কোচ রাজাদের চিরাচরিত নীতি ও আগ্রহের ফলে। এ সম্পর্কে তাই সুকুমার সেন যথার্থই লিখেছেন যে, ‘কোচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ ও তাঁর উত্তরসূরীদের প্রচেষ্টায় প্রাচীন কোচবিহার (যোগিনীতন্ত্র এবং মার্কণ্ডেয় পুরান অনুসারে তার নাম ছিল কামতা রাজ্য) ব্রাহ্মণ শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।[৮] তবে একথা অনস্বীকার্য যে ইংরেজদের সাথে কোচদের সম্পর্কের পূর্বে রাজ্যে শিক্ষা ছিল রাজদরবারে একান্ত নিজস্ব, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে কোচবিহারের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তনের মূলে রয়েছে ইংরেজদের সাথে এই রাজ্যের ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক। ইংরেজ প্রশাসকদের ক্রমাগত চাপ, প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং সক্রিয় সহযোগিতার ফলে ধীরে ধীরে এখানে আধুনিক চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল। তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না, যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার এবং প্রশাসকবর্গ সরাসরি এই রাজ্যে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের কোন চেষ্টা করেননি। এই দেশীয় রাজ্যটির অনুন্নত প্রজাবৃন্দকে আধুনিক জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করার সমোচ্চ কোন বাসনা নিয়ে কোন ইংরেজ মিশনারি এখানে কোনদিন আসেননি। ইংরেজদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় রাজ্যের রাজাকে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলে মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটানো। তাই ইংরেজদের প্রয়াস প্রাথমিকভাবে সীমাবদ্ধ ছিল কোচবিহারের রাজাদের ব্যক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে, একথা প্রচলিত আছে যে প্রয়াত মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের মহিষী মহারানী বৃন্দেশ্বরী দেবীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভার্নাকুলার স্কুল গড়ে উঠেছিল। এই বিদ্যালয়টি মূলত রাজার আত্মীয় পরিজনদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, বিদ্যালয়টিতে পঠন-পাঠনের মাধ্যম ছিল বাংলা ভাষা এবং এটি ছিল একটি নিম্ন বা মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়।[৯] প্রকৃতপক্ষে, ১৮৬১ খ্রিঃ আগে কোচবিহার রাজ্যে জন শিক্ষার সূত্রপাত হয়নি। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়নের রাজত্বকালে ১৮৬১ খ্রিঃ ইংরেজ রাজপুরুষ জেনকিন্সের নামে রাজধানী শহর কোচবিহারে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা ছিল এই রাজ্যের প্রথম সাধারণ বিদ্যালয় যা তাঁর নামে আজও ভাস্বর।

মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালের (১৮৬৩ থেকে ১৯১১) সময় থেকে আধুনিকতার সার্বিক প্রভাব বিস্তার কোচবিহারে আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রসারিত হয়নি, জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল। তাঁর রাজত্বকালে ধর্মনিরপেক্ষতা, শিক্ষা ভাবনার আধুনিকতা, শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া, প্রজার উন্নতিতে বহু কল্যাণধর্মী পরিকল্পনা গ্রহণে নারী স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক কথায় মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবনার মিলনে নতুন এক ভাবনার জন্ম হয়। ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ঊনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ ও আঞ্চলিক পশ্চিমী শিক্ষার ছোঁয়া লাগে এই রাজ্যে, পরবর্তী সময়ের কোচবিহার অধিপতিদের মধ্যে সেই ধারা অমলিন থাকে।ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কারের প্রথম কথাই ছিল নারী মুক্তি, সেই জন্যই তৎকালীন সমাজ সংস্কারকদের দৃষ্টি আরোপিত হয়েছিল নারী শিক্ষা, নারী অধিকার ও প্রগতির দিকে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব পড়েছিল এ দেশেও। ‘এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজ। তাঁরা তৎপর না হলে বাংলার নারী মুক্তি আন্দোলন অনেক বিলম্বিত হত। হিন্দু রমণীদের নারীহিতৈষী ব্রাহ্মদের আন্তরিক চেষ্টার ফলে সমাজের অবহেলিত এবং অত্যাচারিত মেয়েরা সৎ ভাবে বাঁচার পথ খুঁজে পেয়েছিল, একথা স্বীকার করতেই হবে, যে বাংলার নারীজাগরণের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল আর সুনীতি দেবীর কোচবিহারে আগমনের ফলে সেই ঢেউ কোচবিহারে আছড়ে পড়েছিল।

মহারাজা নরনারায়নের রাজত্বকালে রাজ অন্তঃপুরের নিভৃত কোণের রাজমহিষীর মনে যে শিক্ষা ভাবনার স্বপ্ন জেগে উঠেছিল সেটা শিবেন্দ্র নারায়ণ মহিষী বৃন্দেশ্বরীর হাত ধরে বাস্তব রূপ পায় এবং নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে বাংলার নবজাগরণের নবভাবনার পথিকৃৎ কেশব চন্দ্র সেনের দুই কন্যা সুনীতি দেবী এবং সাবিত্রী দেবীর কোচবিহার রাজপরিবারে বিবাহের ফলশ্রুতি হিসেবে নারী শিক্ষা এবং নারী জাগরণের প্লাবন আসে এবং পরবর্তীতেও সেই ধারা অব্যাহত থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় নবজাগরণের এবং আধুনিক চেতনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল ব্রিটিশ রাজধানী কলকাতা আর এই কলকাতারই এক খ্যাতনামা ব্রহ্মবাদী সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন কেশব চন্দ্র সেন। সংস্কৃতির পূর্ণ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় তাঁর মেয়ে সুনীতি দেবীর মধ্যে, তিনিও পিতার ব্রহ্মাদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। ব্রাহ্ম মেয়েরা ছিল অনেক বেশি স্বাধীন, কুসংস্কার মুক্ত। তাদের জীবনশৈলীর ফলে এরূপ চারিত্রিক গুণাবলীর মেলবন্ধন ঘটেছিল সুনীতি দেবীর মধ্যে, ফলে তিনি প্রথম থেকেই ছিলেন অনেক আধুনিক। কেশব চন্দ্র সেনের বাড়ি এবং পরিবারের আধুনিক পরিবেশ সুনীতি দেবীকে আধুনিক ভাবনায় বিকশিত করে তোলে। যার ফলে তার মধ্যে চরিত্রের পবিত্রতা, নিষ্ঠা, স্বাভাবিক তেজস্বিতা, উৎসাহ ও মাতৃ প্রাণতা বিদ্যমান ছিল। পরিবারের আপত্তি সত্বেও ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে ও মদতে কেশব চন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল।[১০] কোচবিহার বাসীর কাছে আলোর ফুলকির ন্যায় কোচবিহারে এসে সুনীতি দেবী প্রজাদের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার, মাদকদ্রব্য নিবারণ, জনসভা ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের কুসংস্কার দূরীকরণে বহুবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পিতার পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এর ফলে একদিকে যেমন পিতার কীর্তি রক্ষিত হয়েছিল, পাশাপাশি উক্ত পুস্তক প্রকাশের ফলে সামাজিক মঙ্গল সাধিত হয়েছিল। এই দায়িত্ব তিনি আজীবন বহন করেছিলেন। সমাজ সংস্কারে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার ব্রাহ্মদের অন্যতম মূলনীতি ছিল, তাঁর আগমনের পূর্বে এ রাজ্যে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার ছিল না বললেই চলে। সুনীতি দেবীর উৎসাহে মহারাজা স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রতি দৃষ্টি দেন। এখানে তিনি আদর্শ সহধর্মিনী এবং যথাযথ রাজমাতার ভূমিকা পালন করেন।

নারীরা অবহেলার পাত্রী নয়, সেই জন্য তাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার। তদানীন্তন সেটেলমেন্ট নায়েব আহেলকার শ্রদ্ধেয় হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর বর্ণনায় তৎকালীন এই অঞ্চলের মেয়েদের সুনীতি দেবী রাজ অন্তঃপুরবাসিনী হয়েও আধুনিক যুগ ভাবনার সোপান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এককথায় বলা যায় যে, কোচবিহার রাজপরিবারের এটি ছিল একটি ব্যতিক্রম জুটি, রাজপরিবারের অন্তঃপুরে আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির নবদিগন্তের সূচনা হয়েছিল সুনীতি দেবীরই ঐকান্তিক চেষ্টায়।[১১] মহারানী সুনীতি দেবীর বিয়ের পরই কোচবিহার রাজ্যে সংস্কার মুক্ত আধুনিক ভাবনার জোয়ার আসে। রাজ্য শাসন ও সমস্ত রকম উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে যেমন মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়নকে আধুনিক কোচবিহার রাজ্যের রূপকার বলা হয় তেমনি একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই মহারানী সুনীতি দেবীই ছিলেন উক্ত কাজের প্রধান সহায়ক।[১২] আবার মহারানী সুনীতি দেবীকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছেন পিতা কেশব চন্দ্র সেন। ব্রহ্মানন্দের আদর্শ ও কর্মধারাকে কোচবিহারে রূপায়ণের ক্ষেত্রে মহারাজা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন এ প্রসঙ্গে তৎকালীন সেটেলমেন্ট নায়েব আহেলকার রায় হরেন্দ্র নারায়ন চৌধুরী সপ্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।[১৩]

মহারানী সুনিতি দেবী ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্না মহিলা, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কোচবিহারের সামাজিক কাঠামোর উন্নতি করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, মানুষের নৈতিক চেতনার উন্মেষের মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটাতে গেলে শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য কিন্তু এই শিক্ষা শুধুমাত্র পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না, তার জন্য প্রয়োজন সংস্কার মুক্ত আধুনিক চেতনায় জাগ্রত উদার মানসিকতার। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েরা ছিল মূলত ভোগের সামগ্রী, মেয়েদের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব মানা হত না। কোচবিহার ছিল এই দিক থেকে সত্যিই অনেকটা পিছিয়ে, এই আধুনিক শিক্ষা কোচবিহারের ক্ষেত্রে আরো দৃঢ়ভাবে প্রযোজ্য ছিল। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে মোট জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ অধিকার করে রয়েছে নারীরা এবং সে সঙ্গে যে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ পারিবারিক কাঠামো অনেকটাই ছড়িয়ে রয়েছে এই নারী জাতির উপরে। সুতরাং একটি দেশ বা জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে নারীরা শিক্ষার ভূমিকাটি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মেয়েদের চরিত্র গঠনে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সুনীতি দেবী একাধিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন, মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য শিল্পকার্য শেখানোর ব্যবস্থা করেন এমনকি কলকাতার যশস্বী শিক্ষক এবং অধ্যাপকদের কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজে এমনকি স্থানীয় বিদ্যালয়ে এনে রাজ্যের শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন এবং বাংলা ভাষা ব্যবহার প্রবর্তন করেন। বহু যোগ্য বাঙালি কর্মচারীকে এখানে এনে রাজ্য প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন, এমন করেই কোচবিহার

রাজ্যের সঙ্গে বঙ্গের মিলন ভাবনার মালা গাঁথা শুরু হয়। বাংলার সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা নবরূপ পায়, শিল্প ও শারীরিক শিক্ষার কথার সঙ্গে সঙ্গে রূপায়ণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়।

করদ রাজ্য কোচবিহারে শিক্ষা প্রসারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ইংরেজ শাসক কুলের শ্লাঘার বিষয়বস্তু, কোচবিহারে শিক্ষা-প্রসারের সাথে পার্শ্ববর্তী ইংরেজ শাসিত জেলার তুলনা করলে দেখা যায় এ রাজ্য কতটা এগিয়েছিল। জলপাইগুড়ি জেলায় ১৮৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত কোন উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না, মাত্র ১৯ টি মিডিল স্কুল ৩৭টি পাঠশালা এবং ৫টি বালিকা বিদ্যালয় (সর্বমোট ৬১) ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৩৫৮ জন এবং মোট ব্যয় ৮৫৪০ টাকা।[১৪] দার্জিলিং জেলায় ১৮৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩টি মিডিল স্কুল, ২৩টি নিম্ন বিদ্যালয় এবং একটি করে নর্মাল স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় ছিল, ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা ছিল ৭২৩ জন এবং শিক্ষাখাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৭৩৫০ টাকা।[১৫] অপরদিকে সমসাময়িক সময়ে ১৮৭৩-৭৪ শিক্ষাবর্ষে কোচবিহারে মোট ১৯৯টি স্কুলে ৪৬০৫ জন ছাত্র ছাত্রী ছিল। কোচবিহারের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণও বেশি ছিল।

পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এখানে কারিগরি শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা ছিল। কোচবিহারের রাজামহারাজাদের ইতিহাসের সঙ্গে পাটিগণিত ও ধারাপাত শেখানো হত এবং একই সঙ্গে মিশনারি মেমসাহেবরা বিভিন্ন হাতের কাজ যেমন কুরুশ বোনা, এম্পোডায়েরী, রুমালে ফুল তোলা ইত্যাদি শেখাতেন এর পাশাপাশি তাঁরা মাঠে নানা রকম শরীরচর্চা শেখাতেন। মিশনারী শিক্ষিকারা এই সমস্ত শিক্ষার বাইরেও ছাত্রীদের বিভিন্ন ধর্মীয় সংগীত শেখাতেন। পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়ের পাঠক্রম বাংলার সঙ্গে সমতা রেখে স্থির করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে একদিকে যেমন ক্রমাগত প্রসার এবং অন্যদিকে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তৎকালীন কিছু বিদগ্ধ পন্ডিতগণ। পরবর্তীকালে কোচবিহারে হিতৈষণীসভার এক অধিবেশনে সভার সহকারী সম্পাদক এবং জেনকিন্স বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায় বলেন 'কোচবিহার রাজধানীতে একটি স্ত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। 'রমণীগণ বিদ্যাবতী হইলে আমাদিগের দেশের বিধিমতে মুখোজ্জ্বল করিবে।[১৬] জেনকিন্স বিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষক হরিমোহন রায় ঐ একই কথা বলেন 'বালকগণের ন্যায় বালিকাগণকেও যে শিক্ষা প্রদান করা অত্যন্ত কর্তব্য ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। যে প্রকারে এদেশে একটি বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয় তৎপক্ষে সকলেরই মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। যদিস্যাৎ বালিকা বিদ্যালয় সত্বরে সংস্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে অত্রস্থ মহোদয়েরা আপনাপন বালিকাগণের শিক্ষার জন্য বিশেষ কোনো উপায় অবলম্বন করুন।[১৭]

সুনীতি কলেজের জন্মলগ্নের ইতিহাসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত কালিকা দাস দত্ত, রতিবাবু প্রকৃত স্থানীয় কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আনুষ্ঠানিক সূচনা লাভ করে। উক্ত বিদ্যালয়টি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রতিবাবুর স্কুল নামেও সমাধিক প্রসিদ্ধ ছিল, কারণ রতিবাবু প্রভৃতি কিছু রাজ্য সরকারি শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের উৎসাহ ও সাহায্য স্কুল প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

উদার ও সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে মহারানী সুনীতি দেবী মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণকে নানান বিষয় সম্পর্কে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিতেন। শিক্ষা সম্পর্কে তিনি খোঁজখবর নিয়ে কোচবিহারে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখলেন সেই প্রস্তাব রাজ দরবারে সহজেই অনুমোদিত হল, কালক্রমে উদ্যোগী শিক্ষানুরাগী মহারানী সুনীতি দেবী রাজ্যে নারীদের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনিতা উপলব্ধি করলে উক্ত রতিবাবুর স্কুলটিই উচ্চ শিক্ষার আসনে উন্নীত হয় এবং ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে সুনীতি কলেজ নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নতুন ভবনে 'সুনীতি কলেজ' নামকরণটি মহারানীর দ্বারা প্রদত্ত হয়েছিল।[১৮] ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে এর ভার মহারানী সুনীতি দেবী গ্রহণ করলেও এর ব্যয়ভার সরকারি শিক্ষা তহবিল থেকে মঞ্জুর হত না। রাণীর ব্যক্তিগত অনুদান ও জনগণের অর্থ সাহায্য এবং নিজস্ব আর্থিক উৎস হতে তা নির্বাহ হত। শিক্ষা বিস্তারে পরম আগ্রহী মহারানীর কৃপাধন্য হবার পূর্বে সুনীতি একাডেমির শৈশব অবস্থা তেমন গৌরবজ্জ্বল ছিল না, মাটির ও বেড়ার ঘরই ছিল এর সূতিকা গৃহ। তারপর ছোট পাকা বাড়ি। ধীরে ধীরে তা প্রাসাদময়ী হয়ে ওঠে রাজকীয় অনুগ্রহের ছায়াপাতে।[১৯]

কুঞ্জবালা রায়চৌধুরীর (প্রাক্তন ছাত্রীর সুনীতি একাডেমি) লেখা থেকে জানা যায় যে প্রথম অবস্থায় এই বিদ্যালয়ে প্রতিমাসে চার পয়সা মাহিনা ছিল। কিন্তু বিদ্যালয় চলবার বেশ কয়েক বছর পরে কোচবিহারের রাজসরকার মেয়েদের শিক্ষা লাভের পথ সুগম করার উদ্দেশে শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করলেন, তখনও কিন্তু সমগ্র বাংলায় কোথাও কোন অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে পূর্ব ভারতের এই রাজ্যেই অবৈতনিক শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপ এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ইতিহাস সত্যিই অনন্য। এক্ষেত্রে তদানীন্তন সেটেলমেন্ট নায়েব আহেলকার রায় হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী প্রদত্ত রিপোর্ট ছিল-

> “Since 1881 there has been a great expansion of the literate class both male and female. The number of literate male was 16305 in 1891 it came upto 24986 the increase was thus over 133 percent. In case of females the increase was of above 135 percent. The rate of increase has been more rapid here than in Rangpur, Dinajpur, Bogra, Rajshahi and Pabna”.[২০]

কোচবিহারের নারী শিক্ষা ও প্রগতির পীঠস্থান সুনীতি কলেজ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ২২শে আগস্ট বারীন ঘোষ, জগদীশ সেন ও নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্মচারীদের সহযোগিতায় সুনীতি একাডেমিতে উন্নীত হয়েছিল। 1925-26 Annual administrative Report ‘Transfer of the management the 1he Academy to the Education Department of the State. ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে সুনীতি একাডেমী উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হল, এই সময় থেকে আইন করে সমস্ত পুরুষ শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক স্থলাভিষিক্ত হল মহিলা প্রধানা ও সহ-শিক্ষিকাবৃন্দ। কলেজ থেকে যখন এই বিদ্যালয়টি সুনীতি একাডেমিতে উন্নীত হল তখন বিদ্যালয়টি বৈতানিকে পরিণত হয়েছিল যদিও এই বেতনের পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বিদ্যালয়টি আবার অবৈতনিক হয়ে যায়।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সমূহের গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি সুনীতি অ্যাকাডেমী পরিদর্শনে এসে যে মন্তব্যটি করেছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় আজও স্মরণীয় হয়ে আছে, তিনি বলেছিলেন, ‘The well attended and well manage school ...which does the State Credit.’ এই কারণেই কোচবিহার ছাড়াও আসাম, পূর্ব বাংলা, গারো পাহাড় অঞ্চলের মেয়েরাও এই বিদ্যালয়টিতে শিক্ষালাভের সুযোগ পেতো সেই সময় থেকে আজও সুনীতি একাডেমী তার গৌরবের ধারা বজায় রেখে চলছে।

ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী উক্ত বিদ্যালয়টি সম্পর্কে বলেছেন –

> “Rammohun Roy and Ishwar Chandra Vidyasagar drew our attention to the crucial importance of women's education which iky rightly regarded as the base of any society's enduring progress. Bengal has been a Forerunner as regards women's education and the Sunity academy of Cooch Behar is a link with those earlier pioneering days”.[২১]

সুনীতি দেবী শুধুমাত্র কোচবিহারে সুনীতি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি। রাজ্যের বাইরেও স্ত্রী শিক্ষা ও মহিলা সমাজের সামাজিক অগ্রগতির জন্য অবদান রেখে গেছেন। কলকাতার ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন এবং দার্জিলিং এ মহারানী গার্লস স্কুলের সঙ্গে সুনীতি দেবের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল। ২২ ব্রাহ্মসমাজ ঘোষিত নীতি অনুসারে মেয়েদের কারিগরি বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে এই রাজ্যে টেকনিক্যাল স্কুল (Technical School) স্থাপিত হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়নের রাজত্বকালে যে আধুনিক কোচবিহারের প্রারম্ভিক সূচনা শুরু হয়েছিল সে ক্ষেত্রে তার প্রিয় পত্নী সুনীতি দেবীর অবদানও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক কথায় সুনীতি দেবীর সঙ্গে নৃপেন্দ্র নারায়নের বিবাহের ফলে উত্তর এবং দক্ষিণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোচবিহারের উন্নতির অন্যতম চাবিকাঠি শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের হাত ধরে কোচবিহারের শিক্ষনীয় বিষয়ে যে উন্নতির নবযাত্রার সূচনা হয়েছিল, তা আজও গৌরবের ধারা বজায় রেখে কোচবিহার বাসীর উন্নতিকল্পে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও

শিক্ষা বিষয়ে সার্বিক উন্নতিতে প্রজাবৎসল মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ এবং তার পত্নী মহারানী সুনীতি দেবী কোচবিহারের আধুনিকরণে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং কোচবিহারকে আধুনিকতার উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তৎকালীন এই দেশীয় রাজ্য তাঁকে স্ত্রী স্বাধীনতার অগ্রদূত বললেও বেশী বলা হয় না। তার জন্য কোচবিহারবাসী এতদিন পরেও তাঁদের প্রতি পদে পদে স্মরণ করে চলেছে।

Reference:

১. Sunity Devee : The Autobiography of an Indian Princess, John Murray, London, 1921, P. 15

২. Sunity Devee : The Autobiography of an Indian Princess, John Murray, London, 1921, P. 31

৩. দেব, রণজিৎ, সাহিত্যের হতিহাসে কোচ রাজদরবার, তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১২৪

৪. Sunity Devee : The Autobiography of an Indian Princess, John Murray, London, 1921, P. 25

৫. দেবী, সুনীতি, অমৃতবিন্দু ২য় খণ্ড নববিধান প্রেস, কলিকাতা, ১৩৩২ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮, ৯

৬. দাস, পম্পা, মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ও তৎকালীন কোচবিহার সমাজ ও সাহিত্য, রেণু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৭৩

৭. দেব, রণজিৎ, সাহিত্যের হতিহাসে কোচ রাজদরবার, তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১২৪

৮. সেন, সুকুমার. বাংলা সাহিত্যের ইতিহ্াস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭০ পৃ. ২৬৯

৯. Das, Biswanath, and Subhendu Majumdar. Princely Cooch Behar; A Documentary study on letters (1790 –1863) Calcutta, 1990 letter no. 5, P. 16

১০. মজুমদার, শুভেন্দু, আধুনিক শিক্ষা ও কোচবিহার ভিকটোরিয়া কলেজ (১৮৮৮ ১৯৩৮) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ২০০০, পৃ. ৩২

১১. তত্ত্বকৌমুদী, পৌষ মাঘ ১.১৬.১৪০১, পৃ. ২০৯

১২. তদেব পৃ. ২০৯

১৩. কোচবিহার দর্পণ পাক্ষিক পত্রিকা, ১ম ব সংখ্যা, ১৪ই এপ্রিল ১৯৩৮, পৃ. ৩৬

১৪. A History of Education in India, Syed Nurrllah and J.P. Naik, Modern book Stall, Bombay, 1951, P. 333

১৫. Hunter, W.W, A Statistical Account of Bengal, Delhi Vol-X, 1974, P. 191

১৬. কোচবিহার হিতৈষণীসভার কার্য্য বিবরণী, ১৮৬৫, পৃ. ৫১, ৫৬, ৮৪

১৭. Annual Administrative Report, Cooch Behar, 1875-76

১৮. সুনীতি একাডেমি শতবর্ষ ভারত সংখ্যা, ১৯৮১ অংশ পৃ. ১১৮

১৯. তদেব পৃঃ ১১৮

২০. Chaudhary, Harendra Narayan. Cooch Behar States and its land revenue Settlement, Cooch Behar state press, Cooch Behar, 1903, P. 148

২১. দাস, পম্পা, মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ও তৎকালীন কোচবিহার সমাজ ও সাহিত্য, রেণু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৫০, ১৫১

২২. সুনীতি একাডেমি শতবর্ষ ভারত সংখ্যা, ১৯৮১ অংশ, পৃ. ১০৮